কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও আমাদের ভাবনা

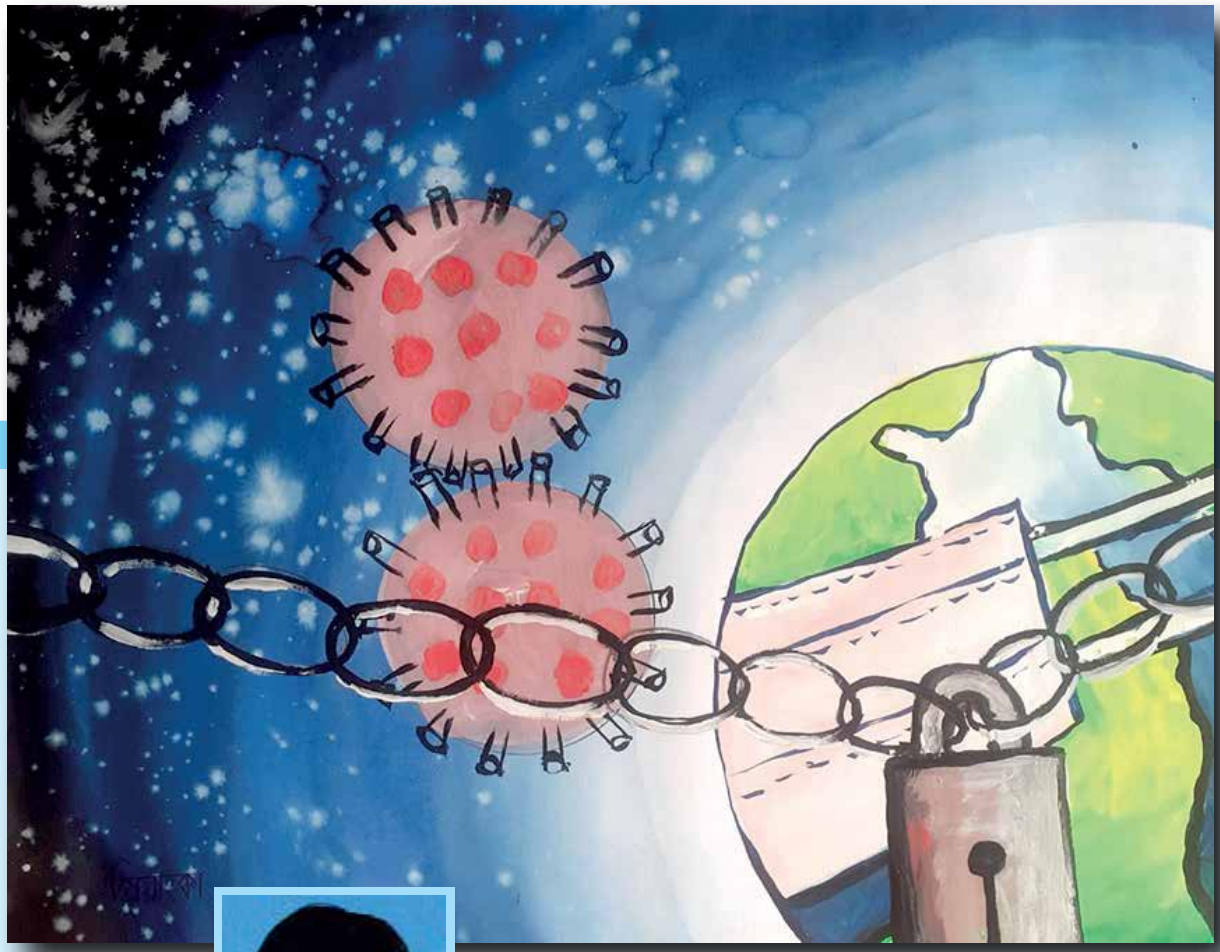

প্রিয়াংকা দাস
শ্রেণি: তৃতীয়, রোল: ১০৯

করোনার গ্রাস : আমাদের অপেক্ষা

মাহিম বিন রশিদ
শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ২৮৬

এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে লিখছি, যখন চারদিক হয়ে আছে স্তব্ধপ্রায়; কোথাও কোনো কোলাহল নেই, উৎসব নেই, আনন্দ নেই, প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই। কোভিড-১৯ মহামারীতে যে কতজনের কত রকম হিসেব ওলট-পালট হয়ে গেছে, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। প্রতিদিন হারানোর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। একেক জনের জীবনে একেক রকম হৃদয় বিদারক গল্পের বুনন হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সবার ওপর এই মহামারী নতুন করে এক যুদ্ধের ভার চাপিয়েছে জীবনযুদ্ধে। আমাদের ভেতরে ভেতরে একটা বিশাল গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে, করোনার ছোবলে যারা জীবনের বিরাট বিপর্যয়ের সাক্ষী। খেটে খাওয়া মানুষদের দুঃখটা এতটাই বেশি, বলে শেষ করা যাবে না। তাই নিজেরটাই বলি।

সপ্তাহে একটা অতিরিক্ত দিন ছুটি পেলে আমাদের খুশির অন্ত থাকতো না। আর এখন অর্ধবছর ছুটি পাওয়ার অভিশাপে পড়ে পর্যদুস্ত হয়ে আছি। আমাদের দৈনিক জীবনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আশিক আঙ্কেল বা আর্জিনা আন্টি জড়িত, এটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। স্কুলের মাঠে বাচ্চাদের কিচির-মিচির, হুটোপুটি; তারই দূর থেকে কেউ একটা 'ভাইয়া, ভাইয়া' বলে দৌড়ে আসছে- এই অনুভূতিগুলো স্বর্গীয়। হোয়াইট বোর্ডের কালো মার্কারের কালিগুলো, সাজানো গোছানো কয়েকটা বেঞ্চ, তাতে কিছু জমে থাকা ধূলো, ভাঙাচোরা কাঁচের জানালা– এই সবকিছুর একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে, টেনে ধরার শক্তি আছে, কী করে বোঝাই!

আমার অনেক বন্ধুর মুখ দেখিনি সেই ছুটির পর থেকে। কোথায় চলে গেছে, কোনো হদিস নেই। সবার প্রথমে দাঁড়াবে বলে প্রখর রৌদ্রেও হুইসেল বাজার আগে যেসব ছোট ছোট বাচ্চা সমাবেশ স্থলে এসে ভিড় জমাতো- তাদের কষ্টটা তো অবর্ণনীয়। বিরক্তি এলেও অনেকে অনলাইন প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা যখন খাতা জমা দিতে আসে, তখন দেখেছি, কী করুণ চোখে ভেতরের ক্যাম্পাসটা দেখছে। হৃদয়বিদারক!

আরেক শ্রেণির কথা বলিনি। এই কিছুদিন আগে মো. আনোয়ারুল কবীর স্যারকে ফোনে কল দিয়েছিলাম। আমি বললাম, "বিশাল একটা ছুটি পেয়েছেন, স্যার। এখন কয়টাদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবেন।" উনি উত্তর দিলেন, "আমরা বরং ছুটি কিছু কমই কাটাবো বাবা, মানুষের কষ্ট তবু কমুক। আমাদের ছুটি না হলেও চলবে।" এঁনাদের জন্যই বোধহয় স্কুল-কলেজে ফেরার আকুতিটা এত বেশি। পৃথিবীর একটা স্তব্ধতা প্রয়োজন ছিল, কোভিড-১৯ সেটা দিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে আমরা হয়তো নতুন মানুষ হয়ে ফিরব। আর সবার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের দুঃখও ঘুচবে। প্রিয় প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আবার কোলাহল জমবে। আমরা আবার পড়ব, খেলব, ছবি আঁকব।

অধীর প্রতীক্ষায় আছি এমন দিনগুলো ফিরে পাওয়ার।

শাকিল আহম্মেদ সিয়াম
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)
রোল: ১৭৪

পড়ন্ত বিকেল

ঢাকার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম বালুচরি। গ্রামের বাবা হারানো একটি ছেলে রাজু। মা ছাড়া এ কূলে কেউ নেই। মা তার ছেলেকে নিয়ে এই গ্রামে বসবাস করছে। একটা ভিটেবাড়ি ছাড়া গ্রামে তার কিছুই নেই। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে সংসার চলে তার। যাদের বাড়িতে তার মা কাজ করে সেই কর্তারা শহুরে মানুষ, তাই পয়সা কম দেয় না। অপরদিকে রাজুর বয়স বেশি হবে না, এই বছর দশেক হবে। সারাদিন ঘুরে বেরিয়ে তার সময় কাটে। খেলাধুলায় সে অনেক ভালো। সকলেই রাজুকে দলে নিতে চায়।

এমন একদিন সন্ধ্যায় রাজু ফুটবল খেলা শেষ করে মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে ফিরছে। বাড়িতে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে মাকে খাবার দিতে বলে । তার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল কারণ সে দুপুরে খাবার খেতে আসেনি। রাজুর মা রাজুকে খাবার দিয়ে বলল, "আজ শরীরটা কেমন জ্বর জ্বর করছে। মাথাটাও ব্যাথা করছে।"

রাজু বলল, "তুই সারাদিন কাজ করিস, নিজের যত্ন নিস না।" রাজুর মা বলল, "না বাবা, কাজ না করলে পেট চলবে কেমনে?"

তারা আর কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পরল। পরের দিন মায়ের জ্বর বেড়ে গেল। খাট থেকে উঠতে পারছে না। রাজু বলল, "মা, তুই আজ কাজে যাসনে।"

তার মা কাজে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় যেতে পারলো না। কারণ মা যেখানে কাজ করতেন সেই বাড়িতে শুনেছিল নতুন একটা রোগ এসেছে, যা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে ছড়ায়। রাজু ওসব কিছু জানে না এবং খবরও রাখে না। সারাদিন এপাড়া-ওপাড়ায় খেলেই দিন চলে যায়। মা ভাবল আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল কাজে যাবে। কিন্তু ৩ দিন চলে গেল তার জ্বর, কাশি, সর্দি, মাথা ব্যাথা ভালো হলো না। রাজু বলল, "মা, তুই ডাক্তার দেখাস না কেন? তোর জ্বর তো কমছে না। চল কাল হাসপাতালে যাই ডাক্তার দেখাতে।" মা ভাবল শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে ডাক্তার দেখানোই ঠিক হবে। তাই তারা কাল ডাক্তার দেখাবে বলে ঠিক করল।

পরের দিন সকাল সকাল রাজু ও তার মা শহরের হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। রাজুর শহরে যেতে ভালোই লাগে। শহরের বড় বড় বাড়ি, অনেক গাড়ি , কোলাহল তার অনেক পছন্দের। কিন্তু এবার সে একটু অবাক হলো। রাস্তা-ঘাটে যাকে দেখে সবাই মুখে কাপড় পরে ঘুরছে। সে এমন মুখের ঢাকনা গ্রামে গরুদের মুখে দেখেছে। গরু অন্যের ফসল যাতে না খেতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু শহুরে লোকেরা কেন মুখে কাপড় পড়েছে সে বুঝতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর তারা হাসপাতালে পৌঁছাল। রাজু দেখলো হাসপাতালের ভিতরেও সবার মুখে কাপড় দেওয়া। সবাই একে অন্যের থেকে দূরে দূরে থাকছে। হাসপাতালে ঢুকতেই এক লোক তাদের মুখে ঢাকনা দিয়ে গেল। রাজু এর নাম জানে না। রাজু তার মাকে বলে–এটার নাম কী? মা বলে–মাস্ক টাস্ক এমন কিছু। তারা সেটা মুখে দিয়ে হাসপাতালের ভিতর গিয়ে ডাক্তার দেখালো। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো করিয়ে ডাক্তারকে দেখানোর পর ডাক্তার বলে তার মায়ের কী যেন একটা নতুন রোগ হয়েছে। ডাক্তার তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। রাজু দেখে তার মাকে একটা নির্জন ঘরে রাখা হয়েছে। তাকে মায়ের সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না। রাজু তার মায়ের ঘরের সামনে মেঝেতে রাত কাটায়। পরের দিন সকালে ডাক্তারের কাছে তার মায়ের অবস্থা জানতে চায়। ডাক্তার বলেন, "তোর মায়ের ফুসফুস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" রাজু অত কিছু বোঝে না, ভাবে কবে তার মা ভালো হবে আর কবে গ্রামে গিয়ে খেলবে।

ইতোমধ্যে রাজুর সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে ডাক্তার তার মাকে দেখে আর রাজুকে বলে যায় "তোর মায়ের অবস্থা খারাপ।" এভাবে চৌদ্দ দিন চলে গেল। সে হাসপাতালের বারান্দায় ২৪ ঘণ্টা বসে থাকে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ঘরে মানুষ মরে। মানুষের কান্নায় স্তব্ধ হয়ে যায় হাসপাতালের বারান্দা। কত মানুষ মরলো সে তা গুনতে পারে না। কোনো এক নিস্তব্ধ রাতে হিমশীতল ঘরে বন্ধ হয়ে যায় হৃদস্পন্দন। রাজু বারান্দায় বসে বসে দেখে, যারা মারা যাচ্ছে তাদের পরিবারের কেউ তাদের লাশের কাছে যাচ্ছে না। অনেকে তাদের বাবা অথবা মায়ের লাশ হাসপাতালের বারান্দায় ফেলে চলে গেছে। এতদিনে সে জানতে পেরেছে এসব লোক করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তার মায়েরও নাকি এ রোগ হয়েছে। তার মাও কি মারা যাবে এদের মতো? সে উত্তর পায় না। সে উত্তর পায় ১৪ দিন পর এক রাতে।

রাত তখন ১০টা। রাজু বারান্দায় ঘুমাচ্ছিলো। তখন ডাক্তার এসে তাকে ডাকল আর বলল, "তোর মা আর বেঁচে নেই।" রাজু উঠে বলল, "কী! আমার মা মারা গেলো কী করে? আমি তো আপনাদের অনেক টাকা দিয়েছি; তাও আমার মাকে আপনারা বাঁচাতে পারলেন না?" ডাক্তার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। তখন দু'জন লোক তার মাকে অদ্ভুত একটা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নে তোর মায়ের লাশ।" বলে চলে গেল তারা।

বারান্দার এক কোণায় রাজু আর তার মা পড়ে রইল। রাজু তার মায়ের লাশের পাশে বসে নিস্তব্ধ রাতের শূন্যতা অনুভব করতে লাগলো। লোকগুলো তার মায়ের লাশের থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছিল। সে ঐ রাতে আর ঘুমায় না। ভোর হলে সে তার মাকে গ্রামে নিয়ে আসে।

গ্রামে এসে সে আরেকবার অবাক হয়। গ্রামের কেউ তার মায়ের জানাযায় আসে না। সে একাই কবর খুঁড়ে, জানাযা পড়িয়ে মায়ের লাশ দাফন সম্পন্ন করে। রাজুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসলো না। সে পড়ন্ত বিকেলে মায়ের কবরের পাশে বসে ভাবে এই অদ্ভুত রোগের কথা। তার ভাবনা শেষ হয় না।

বর্তমানে এই অদ্ভুত রোগের কারণে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে রাজু ও তার মায়ের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের পরাজয়ের গল্প।

ছড়া-কবিতায় করোনা-ভাবনা

মো. শাহরিয়ার কবির চৌধুরী
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান), রোল : ১১৪

করোনায় জীবনকাল

কোথা থেকে যে ভাইরাস এলো?
জীবনটা করলো এলোমেলো।
জীবনের অনেক মূল্যকে,
করলো সে অমূল্য।
যা ভাবিনি কখনো, তা হয়েছে আজ
জীবন থেকে চলে গেল দীর্ঘ নয়টি মাস।
অনেকের জীবন করেছে কালো,
অনেকের জীবন দুর্বিষহ।
গরিবের পেটে জোটে না ভাত,
তারা বলে আজ দূর হয়ে যাক।
এটি একটি যুদ্ধ বটে,
আমরা সবাই যোদ্ধা।
অস্ত্রহীন করোনা যুদ্ধে,
মেতেছি সর্বদা।
ধর্মপ্রাণ মুসলমান আজ নাহি পারে যেতে নামাজে,
কাবা শরিফ আজ নিস্তব্ধ এর প্রকোপে।
করোনায় আজ ঝুলছে তালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে,
মন চাইলেও যেতে পারি না প্রিয় বিদ্যাপীঠে।
জানি না কবে এর শেষ হবে?
কবে যে আসবে সুদিন?
অন্ধকারকে পেছন ফেলে,
জয় হবে একদিন।
কবে আমরা ফিরবো আবার?
আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে?

মুসাব্বির আলম সাব্বির
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ১৫২

অসম সমীকরণ

উন্নত বিশ্বের বাধার সমীকরণ
করোনা ভাইরাসের আগমন
সারা বিশ্ব থমকে গেছে
করোনা ভাইরাসের স্পর্শে।
মৃত্যুপুরিতে বিজয় উল্লাস
সারা বিশ্বের মানুষের সর্বনাশ।
রাস্তা-ঘাট অফিস আদালত হয়েছে বন্ধ
ঠিক মতো কেউ খেতে পারে না,
মনুষ্যত্ব কোথায় তুমি...
হয়েছ কি অন্ধ?
করোনা ভাইরাসের সঠিক তথ্য জেনে
সর্বদা মোরা চলব মেনে।
করোনা ভাইরাস একবার হলে
দরজা-জানালা বন্ধ করে
বন্ধুদের থেকে অনেক দূরে।
ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য।
থাকব আমরা একা ঘরে।
জ্বর, কাশি, সর্দি হলে,
আইসোলেশনে নিজেকে গুটিয়ে রেখে
আতঙ্কিত না হয়ে
ভাইরাস রুখতে হবে নিজ বলে।

মাসউদা জান্নাত
শ্রেণি: সপ্তম, রোল: ৮২

লকডাউন

গোটা শহর চুপ
যেন নির্বাক রাত,
নেই কোনো কোলাহল
নেই কোনো আওয়াজ।
এক দুই তিন করে
কেটে যাচ্ছে দিন,
যেন গতদিনই ছিল শুক্রবার
আজ আবার একই দিন।
হায়! হায়! সময় তো যাচ্ছে
কিন্তু আমি কী করছি?
সকাল দুপুর আর রাতে
থাকছি শুধু টিভি আর মোবাইলে,
চায়ের দোকানে আর
আড্ডাটা কি জমবে না?
একবার লকডাউন কেটে গেলে
কেউ আটকাতে পারবে না।
কিন্তু কাটবে কি এই লকডাউন!
যদি এভাবেই সব চলে!
রাস্তাঘাটে ঘুরছো কেন তোমরা দলে দলে?
আমি তো ভাই বাঁচতে চাই
জীবন অনেক দেখার বাকি।
পুলিশ দেখে পালিয়ে গিয়ে
নিজেকে দিচ্ছ কেন ফাঁকি?
জানো আমি নিজেকে কেন
ঘরে বন্দি করে রাখি?
কারণ আমি শুধু নিজের পরিবারকে নয়,
প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসি।

স্মার্টফোনের নীল আলোয়...

মো. তারেক হাসান
প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

রাত ৩:৩০ মিনিট। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও অভ্র'র ঘুম আসছে না। বেশ কয়েকদিন থেকেই এ সমস্যা হচ্ছে। কয়েকমাস আগেও অভ্র নিয়মিতভাবে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা বা রাতে ১২ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পরার ব্যাপারে বেশ অ্যাক্টিভ ছিল। কলেজের ক্লাশ শেষ করে দুপুরে মেসে খাবার খেয়ে কয়েক মিনিটের জন্য বিশ্রাম করে চলে যেতো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন স্যারের কাছে প্রাইভেট কোচিং এর জন্য। তিন চারটা বিষয়ের প্রাইভেট কোচিং প্রতিটা এক ঘণ্টার করে হলেও সব শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তবে সে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় রুমে ফিরে আসার চেষ্টা করে। কোনদিন স্যার হঠাৎ পড়াতে না পারলে বন্ধুদের সাথেই আড্ডা দিয়ে বাকি প্রাইভেট কোচিং শেষ করে রুমে ফিরে আসত। সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সে ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে কলেজের কাছেই একটি মেসে রুম ভাড়া করে থাকত। দূরের প্রাইভেট কোচিং সময়মতো পৌঁছানোর জন্য সে সাইকেল ব্যবহার করত। এছাড়াও বাবা-মা, স্যার বা ম্যাডাম, বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার একটা ফিচার ফোন ছিল। তার বন্ধুদের অনেকের হাতেই স্মার্টফোন থাকলেও নিজের একটা স্মার্টফোন থাকার সুপ্ত বাসনা কখনো মা-বাবাকে মুখ ফুটে বলেনি। যাই হোক, প্রতিদিন অভ্র সন্ধ্যায় সময়মতো রুমে ফেরার কারণে মাঝে মধ্যে বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য হয়েছে। তবে এটা নিয়ে সে খুব একটা চিন্তিত ছিল না কারণ সে কখনো নিজেকে ফাঁকি দিতে চায়নি। মেসে ফিরে অভ্র ফ্রেশ হয়ে প্রথমেই ৩০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নেয়। অনেকবার বিশ্রাম করতে গিয়ে সে ঘুমিয়েও পড়েছিলো! সেই দিনগুলোতে সে রাতে অতিরিক্ত সময় জেগে ঐ দিনের পড়া শেষ করে ঘুমাতো। এছাড়া অন্যান্য দিনে খাবারের সময় ছাড়া ৭:৩০ থেকে ১২টা পর্যন্ত একটানা পড়াশোনা করত। যেহেতু সে প্রতিদিন এই রুটিনমাফিক নিজের কাজকর্ম, পড়াশোনা ইত্যাদি করতো, তাই ঘুমানোর জন্য গভীর রাত সে কখনো করেনি। রুমমেটের ব্যবহার করা স্মার্টফোনে ক্ষণে ক্ষণে আগত নোটিফিকেশন কিছুটা বিরক্তির উদ্রেক করলেও অভ্র প্রতিদিনের অধ্যায়ভিত্তিক পড়া, হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট সময় মতো শেষ করার কারণে পড়াশোনায় তার অতিরিক্ত চাপ মনে হয়নি। স্মার্টফোনের নীল আলোয় পাবজি খেলায় ডুবে থাকা অভ্র'র রুমমেট প্রায় তাকে জিজ্ঞেস করে "দোস্ত, আমার কী হবে! আমি তো পড়াশোনা করার সময় পাই না!" স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহ থাকায় সাপ্তাহিক বন্ধ বা কলেজ ছুটির দিনগুলোতে অভ্র তার বন্ধুর কাছে মোবাইল নিয়ে গুগল করা, ব্রাউজিং করা, সময় কাটানোর মতো কিছু গেইম খেলা, মেসেজিং বা ইমেইল এর মতো টুকিটাকি কাজ করত।

ইতোমধ্যে করোনার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হলো আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র-জনপদ। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কবে আবার খোলা হবে তা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনায় আর পিছিয়ে না পরে সেটি বিবেচনা করে অনলাইনে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনলাইন ক্লাসসমূহে অংশগ্রহণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো মাধ্যম হলো ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোন/পিসি/ল্যাপটপ। কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের পাঠদান থেকে শুরু করে পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনে শুরু হয় এবং নতুন স্মার্টফোনের সাহায্যে অভ্রসহ কলেজের সকল শিক্ষার্থী নতুন এই পাঠদান ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরকম মহামারী বা দুর্যোগের সময় শিক্ষার্থীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে অনলাইন পাঠদান ব্যবস্থা আশীর্বাদস্বরূপ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উঠতি বয়সের এই শিক্ষার্থীদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেয়াটা দুশ্চিন্তার কারণও বটে!

করোনা মহামারীর নয় মাস পেরিয়ে গেছে। শুধু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল ধরনের অফিস, দোকান-পাট, কল-কারখানা প্রভৃতি চালু হয়ে গেছে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে। মহামারীর এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষ জীবিকার টানে ঘর থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে। কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এখনো ঘরবন্দী। অভ্র'র বেশিরভাগ সময় এখন কাটে স্মার্টফোন ব্যবহার করে। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমের খবর বা নোটিশ মেসেঞ্জারে একাডেমিক গ্রুপে শেয়ার করা হয়। তাই কয়েকবার ডাটা কানেকশন অন করে নোটিফিকেশন চেক করলেই কার্যত সেই সব নোটিশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ থাকলেও অভ্র'র প্রায় সারাদিন ডাটা কানেকশন অন করে রাখতে হয়। কারণ সে মেসেঞ্জারে একাডেমিক গ্রুপ ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু গ্রুপ (Trollers, Together Forever, Boring classes, Hopeless) ও চ্যাটরুমের সাথে সংযুক্ত। দিনের লম্বা সময় তার সে সকল চ্যাট রুমে কেটে যায়। ফলে সে সকল গ্রুপের নোটিফিকেশনও তাকে সবসময় খেয়াল করতে হয়। তাই সে তার স্মার্টফোন সবসময় সাইলেন্ট করে রাখে। এতো নোটিফিকেশন এর

ভীড়ে অনেক সময় কলেজের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশও সে এখন দেখার সময় পায় না। তাছাড়া, সে ইদানিং সন্ধ্যার পর ঠিক যখন পড়ার টেবিলে পড়তে বসার কথা তখন সে লুকিয়ে 'ফ্রি ফায়ার' খেলতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখন কেটে যায় ইদানিং সে আর এতো খেয়াল করে না। এভাবেই সে দীর্ঘ সময় রাত জাগে এবং অনেকদিন 'ইউটিউব' এ ভিডিও দেখে রাত কেটে ভোরও হয়ে গেছে। ফলে সে নিয়মিতভাবে অনলাইন ক্লাসগুলোতে উপস্থিত থাকতে পারে না। ক্লাশে উপস্থিত থাকলেও ক্লাস লেকচারগুলো সে আর খাতায় নোট করে না, 'Screenshot' নিয়ে রাখে। পরবর্তীতে সে শুধু স্ক্রল করতে থাকে কিন্তু কলম-খাতার যে সম্পর্ক সেটি সে প্রায় ভুলতে বসেছে। ডাটা কানেকশন অফ রাখলে তার অস্থির লাগে। তাই পড়ার টেবিলে বসে একটু আধটু পড়াশোনা শুরু করলেও ক্রমাগত আসতে থাকা নোটিফিকেশন এর জন্য তাকে কিছুক্ষণ পর পর মোবাইল স্ক্রীনে তাকাতে হয় এবং সাথে সাথে রিপ্লাই করতে হয়। এছাড়াও প্রতিদিন ঘুমানোর আগে 'ফেসবুক' এ হোম পেইজ স্ক্রল করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে 'TikTok/Likee' এর মতো ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপেও তার ফলোয়ার চোখে পরার মতো!

আমাদের আসলে বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে অভ্র স্মার্টফোনের প্রতি চরমভাবে আসক্ত। অভ্র নামটি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হলেও সে আসলে তার সমবয়সী সকল শিক্ষার্থীর পরিচয় বহন করছে। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে আদৌ এতগুলো বিষয় (Facebook, Youtube, Messenger, TikTok/Likee, Mobile Games) মাথায় রেখে সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার কাজটি কি সহজ? করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রতিষ্ঠানের অনলাইন পাঠদান ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাকে স্মার্টফোন নামের 'ফ্যাটম্যান' বা 'লিটল বয়' কিনে দেয়া কি তার বাবা-মায়ের ভুল ছিল? কখনো নয়। আবার আমি এটাও মানতে নারাজ যে, করোনা পরিস্থিতির কারণেই অভ্র স্মার্টফোনে আসক্ত হয়েছে। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখন এটা সত্যি যে আমরা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যা আমাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় অবস্থার উপর ব্যাপকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কিন্তু যদি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি তাহলে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারবো স্মার্টফোনের প্রতি চরমভাবে আসক্ত হওয়ার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আরও অনেক আগে থেকেই তা আমাদের অসংখ্য শিক্ষার্থীকে নিরবে গ্রাস করে চলেছে। রাস্তার পাশে ফুটপাতে বা বিকেলের আড্ডায় অথবা অবসর সময়ে প্রকৃত বন্ধু পাশে থাকা সত্ত্বেও এখন অনেক শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন তালুবন্দী করে টেক্সটিং বা গেম খেলা অথবা অযথা বিভিন্ন অ্যাপস ব্রাউজ করার ব্যাপারগুলো খুব সহজেই চোখে পরে। স্মার্টফোনের এ রকম লাগামহীন ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বাস্তব ও জীবনমুখী সম্পর্ক তৈরি করার পরিবর্তে ভার্চুয়াল ও ফেইক/নকল সম্পর্ক তৈরির সুযোগ করে দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, গেমিং বা বিরামহীন ভিডিও কনটেন্ট প্রদর্শনের ফলে বাস্তব পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন বা কাছের সম্পর্কগুলো শিথিল হতে থাকে। সেই সাথে নিজের আপন সত্তা, শখ, নিজেকে মূল্যায়ন করার মতো ব্যাপারগুলো হারিয়ে যেতে থাকে এবং একটা সময় পর শিক্ষার্থীরা একাকিত্ব ও হতাশায় ভুগতে থাকে। এছাড়াও একদিন মোবাইল ফোন ছাড়া থাকলে বা কোথাও বের হলে তাদের মধ্যে এক প্রকার ভয় বা আশঙ্কা কাজ করে! অত্যধিক আসক্তির জন্য তাদের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সৃজনশীল কাজের প্রতি তাদের অনীহা, নির্দিষ্ট কোন পড়া বা কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়াও রাত জেগে স্মার্টফোনের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের ঘুম ব্যাহত করে, যা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও শেখার দক্ষতাকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

করোনা মহামারী পরিস্থিতি খুব দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে না, এ ব্যাপারে আমরা সবাই অবগত। এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রটি সুচারুরূপে এগিয়ে নিবে এটাই প্রত্যাশা। আমরা তাদের অভিভাবক, বাবা-মা বা শিক্ষক হিসেবে কোন কাজটি তাদের জন্য সাফল্য বয়ে নিয়ে আসবে শুধু সেটিই যোগান দিতে পারি। শিক্ষার্থীদের বোঝা উচিত, কষ্টে উপার্জিত এক টাকার মূল্যও একজন বাবা বা মায়ের কাছে লক্ষ টাকা সমান। তাই তোমার হাতে থাকা স্মার্টফোনটির মূল্য তোমাকে টাকায় নয় হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। এটা তোমার হাতে এখনি তুলে দেয়ার যথার্থতা তোমার বিবেচনা করতে হবে। স্মার্টফোনটির নীল আলোয় ডুবে না থেকে ডিভাইসটির পরিমিত ব্যবহার করতে হবে। স্মার্টফোন সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা নেই এমন অভিভাবকের সংখ্যা অসংখ্য। বাবা-মা, অভিভাবক এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা যদি সত্যিই থেকে থাকে তাহলে কখনো তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ না নেয়া তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হিসেবে পালন করা উচিত। নীতি-নৈতিকতা স্খলনের হাজার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা যেন নিজের বিবেকের কাছে একটি প্রশ্ন করার সৎ সাহস রাখে যে- সে যে কাজটি করছে সেটি কি আদৌ ঠিক? এর যথার্থ উত্তর আশা করি শিক্ষার্থীদের পরিশুদ্ধ করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোনের আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনার অনেক উপায় থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে কিছুই লিখছি না। তারপরও আমি খুব ভালো করেই জানি, এই আসক্তি থেকে তোমাকে তোমার অভিভাবক ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও কি কোন লাভ হবে? তুমিই যদি না চাও?... তাই শিক্ষার্থীরা এর সঠিক সমাধান আসলে তোমাদের কাছে। নিজেকে জানো, নিজের ভালো-মন্দ বোঝার চেষ্টা করো। তোমার জীবনের গল্প অতীতে ফিরে গিয়ে পরিবর্তন বা সংশোধন করার সুযোগ যেহেতু পাবে না, তাই তুমি চাইলেই গল্পের শেষটা নতুন করে সাজাতে পারো। মনে রাখবে বাস্তবতার মতো কঠিন আর কিছু নেই। এটাই জীবন। শেষের দিকে এসে একটা কথা মনে পড়ছে- "Perception is not reality, even salt looks like sugar." সৃষ্টিকর্তা তোমাদের সকলকেই কিছু না কিছু অনুপম দক্ষতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের মতো মানুষ হও, সম্মানিত করো তোমার বাবা-মাসহ পুরো পরিবারকে।

করোনা উত্তর শিক্ষাক্ষেত্র : একটি অণুভাবনার বিশ্লেষণ

মো. মোশাররফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

"একদিন ঝড় থেমে যাবে/ পৃথিবী আবার শান্ত হবে,
বসতি আবার উঠবে গড়ে/ আকাশ আলোয় উঠবে ভরে,
জীর্ণ মতবাদ সব, ইতিহাস হবে/ পৃথিবী আবার শান্ত হবে।"
– নচিকেতা চক্রবর্তী

আশাই জীবন, স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সংকট একদিন কেটে যাবে, মানুষের মধ্যকার সকল অস্থিরতা স্বস্তিতে রূপান্তরিত হবে। মরুভূমির ঝড়ে আটকে পড়া কাফেলাও ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখে। করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকটের এই মহাদুর্যোগের সময় পুরো পৃথিবী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে; ছন্দ হারিয়েছে সকল স্বাভাবিক কার্যক্রম। যার করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষা কার্যক্রমও। তবুও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আমরা বলতে চাই –'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।' আমরা স্বপ্ন দেখছি খুব দ্রুত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরি হবে এবং মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত হবে। তবে করোনা পরবর্তী শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' করোনা ভাইরাসের নির্মম থাবায় পৃথিবী নামক গ্রহে যে স্থবিরতা নেমে এসেছে, তা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রও বাদ পড়েনি। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত রাষ্ট্রগুলো অনলাইন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিলেও, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে অনলাইন মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায়নি। তারপরও দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থায় অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ায় করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদেরকে ব্যাপকতর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। করোনা পরবর্তীকালে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে এবং পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব তাই মূলত আলোচনার প্রাণভোমরা হিসেবে বিবেচ্য।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় ২০০টি দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। করোনাকালে শিক্ষার্থীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে নিকট ভবিষ্যতে সমাধানের সহজতর উপায় পাঠ্যক্রম সংক্ষিপ্তকরণ। কারিকুলাম পুনঃসংস্করণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। জিডিপির মাত্র ২.২ শতাংশ বাজেট আরো বাড়িয়ে শিক্ষাবান্ধব বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক বাজেট প্রদান এখন সময়ের দাবি। পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের মধ্যে সমন্বয়ের পথ সুগম করে দিতে হবে। যথাযথভাবে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। আক্ষরিক অর্থেই কার্যকরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কেননা, পাঞ্জেরী আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত অর্থে প্রযুক্তি-দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হলে সবকিছুর গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে। হোম স্কুলিং আইডিয়া অভিভাবকদের মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস চালাতে হবে। বিশেষত আমাদের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরেই বইবিমুখ থাকায় এবং ইলেকট্রিক ডিভাইস কেন্দ্রিক নিত্য চলাচলের যে অভ্যাস

গড়ে উঠেছে- সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের মুদ্রিত বইয়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যথাযথ কাউন্সেলিং এক্ষেত্রে মানসিক সংকট থেকে উত্তরণের একটা উত্তম উপায় হতে পারে। জীবনানন্দ দাশের মতোই স্বপ্ন দেখে আমরা অজানা পথে পাড়ি দিতে চাই-

"সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে- এ পথেই পৃথিবীর
ক্রমমুক্তি হবে/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।"

করোনা পরবর্তী কার্যক্রমে শিক্ষার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে আমাদের কী কী করণীয় হতে পারে, সে ব্যাপারে ভাবতে হবে। নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা আলোর পথে চলতে পারি।

* শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সকলের জীবনাচরণে কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি। যেমন: শারীরিক দূরত্ব মেনে চলা, যথাযথভাবে মাস্ক পরিধান করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, টিস্যু পেপার সঙ্গে রাখা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাত ধোয়ার অভ্যাস অব্যাহত রাখা, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা ইত্যাদি। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সব স্থান বিশেষ করে ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, কমনরুম নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

* শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাস রুম পরিচালনা। এক বেঞ্চে দুইজন কিংবা এক ডেস্কে একজন শিক্ষার্থীকে বসাতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পিরিয়ড সংখ্যা কমিয়ে দুই শিফট চালু করা যেতে পারে। যেহেতু দীর্ঘদিন পরে শিক্ষার্থীরা পুনরায় প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হবে সেহেতু দলবদ্ধভাবে আড্ডা দেয়া, কোলাকুলি করা বা করমর্দন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* শিক্ষার্থীদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্কুল ক্যান্টিনে সেরকম খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। হাত যথাযথ নিয়মে পরিষ্কার করার পরে টিফিন গ্রহণ শেষে খাবারের প্যাকেট/উচ্ছিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে সকলের মধ্যে এই সচেতনতাবোধ ধরে রাখার জন্য নিয়মিত প্রেষণা প্রদান করতে হবে।

* শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন: কাউন্সেলিং, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা, সহশিক্ষা কার্যক্রমে জোর প্রদান করা, নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাবার খাওয়া ইত্যাদি।

* নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি ছুটির দিনগুলোতে পড়াশোনা এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে শিক্ষার্থীদের জন্য 'অনলাইন রেকর্ডেড ক্লাস' অথবা 'ডিজিটাল ক্লাসরুম' এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ডিজিটাল ডিভাইস শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পোষাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইউটিউবসহ বিভিন্ন নিরাপদ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডেড ক্লাস/কনটেন্ট দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়তি জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

* শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রয়াসই পারে করোনা উত্তর শিক্ষা সহায়ক মানবিক ও সুস্থ সমাজ গঠন করতে। সেক্ষেত্রে অভিভাবকগণকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীর স্কুলের সময় ব্যতীত বাকি সময় সন্তানের প্রতি বাড়তি নজরদারি রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানকৃত পাঠ্য গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে মানসিকভাবে চাঙা থাকে সেদিকে তদারকি রাখতে হবে।

সংকট উত্তরণের মধ্য দিয়ে আবার কর্মচঞ্চল হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো- এটাই এখন নিত্যকার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। আবার শিশু-কিশোরদের কলকাকলিতে ভরে উঠবে আমাদের বিদ্যার আলয়গুলো। কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রতিষেধক ব্যবহার, যথাযথ স্বাস্থ্যসূচি মেনে চলার মধ্য দিয়ে নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠবে আগামীর প্রজন্ম। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে দুর্বার গতিতে নব দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে আগামীর প্রজন্ম– সেই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা সুহৃদ সমাজের।